কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকলায় মুক্তিযুদ্ধ

মোঃ বনি আদম*

সারসংক্ষেপ : বাঙালির দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ অর্জন ১৯৭১ সালের নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের চারুশিল্পচর্চা ও অনুশীলনে মুক্তিযুদ্ধের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। শিল্পীর তুলিতে উঠে আসে মুক্তিযুদ্ধ নামক মহাকাব্যের নানা বিষয়। চারুশিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে প্রাণে ধারণ করেন প্রবল আবেগে, যার প্রতিফলন ঘটে তাদের শিল্পকর্মে নানা রঙে, ঢঙে তথা আঙ্গিকের ভিন্নতায়। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর শিল্পকর্মও সমৃদ্ধ হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের কথামালায়। এ প্রবন্ধে কাইয়ুম চৌধুরীর মুক্তিযুদ্ধ- বিষয়সংবলিত চিত্রকলার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সত্য স্বরূপকে তুলে ধরা হয়েছে।

'বিশ্বের যেখানেই তাঁর ছবি প্রদর্শিত হোক না কেন যেন বাঙালির হাতের কাজ বলে চেনা যায়' (শামসুল, ২০১৪ : ২১) — এমন দেশাত্মবোধক শিল্পীর নাম কাইয়ুম চৌধুরী। বাংলার নিসর্গ, লোকমানুষের জীবনগাথা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কথকতা, বাংলার লোকঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী চেতনায় সমৃদ্ধ শিল্পী কাইয়ুমের ক্যানভাস। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে বইয়ের প্রচ্ছদ অঙ্কনে ও অলংকরণে তিনি যুগান্তর ঘটান। শিল্পী রেখাঙ্কনে বলিষ্ঠতা, প্রচ্ছদে নিজস্বতা নিয়ে ক্যানভাসের বিন্যাসে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশেলে স্বতন্ত্র রীতিতে নিজেকে মেলে ধরেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন অনন্য উচ্চতায়। আলোচ্য প্রবন্ধে কাইয়ুম চৌধুরীর অনন্য সৃজন প্রতিভার অংশ মুক্তিযুদ্ধের চিত্রকলা নিয়ে আলোচনায় প্রয়াসী হব।

কাইয়ুম চৌধুরীর মুক্তিযুদ্ধের চিত্রকলা নিয়ে আলোচনার প্রারম্ভে তাঁর ব্যক্তিজীবন, শিল্পশিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

শিল্পশিক্ষা ও বর্ণাঢ্য জীবন

বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। জন্ম ১৯৩২ সালের ৯ মার্চ ফেনীর শর্শদিতে। শিল্পীর বাবা একজন সমবায় ব্যাংক কর্মকর্তা হলেও তিনি ছিলেন সাহিত্য ও সংগীতানুরাগী। *ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মানসী ও মর্ম্মবাণী, বঙ্গশ্রী, মোহাম্মদী, Modern Review*-এর মতো পত্রিকা ও কলের গানের রেকর্ডের সংগ্রহ ছিল শিল্পীর বাড়িতে (আজিজুল, ২০১৫ : ১১)। পারিবারিক এমন সাংস্কৃতিক আবহ কাইয়ুমের শিশুমনে

* সহযোগী অধ্যাপক, চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পত্রিকার সচিত্রকরণ দেখে যেমন আনন্দ পেতেন তেমনি গানের প্রতিও সৃষ্টি হয় তাঁর গভীর অনুরাগ। বাবার বদলি চাকরির সুবাদে কাইয়ুম চৌধুরী স্কুল জীবনেই ঘুরেছেন দেশের নানা অঞ্চল। ফলে দেশের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি ও জনজীবন শিল্পীর মনে নিসর্গ-প্রীতি ও মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার সৃষ্টি হয়। এসব কিছুই যেন বাল্যকালে তাঁর মনে শিল্পী হওয়ার বাসনা সৃষ্টি করে।

নড়াইলে থাকা অবস্থায় দেব সাহিত্য কুটিরের *কাঞ্চনজঙ্ঘা* সিরিজের বই, প্রতুল বন্দোপাধ্যায়ের ইলাস্ট্রেশন প্রভৃতি কাইয়ুম চৌধুরীর মনে শিল্পী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে — 'ওই রকম ছবি যদি আঁকতে পারতাম'। ফেনীতে থাকা অবস্থায় হাতে লেখা পত্রিকা বের হতো, সে পত্রিকায় ছবি আঁকানোর কাজটি করতেন কাইয়ুম চৌধুরী (আজিজুল, ২০১৫ : ২৪)। আর এভাবেই সৃষ্টি হয় তাঁর ছবি আঁকার নেশা এবং নবম দশম শ্রেণির ছাত্রাবস্থাতেই তৈরি হয় আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন। এ প্রসঙ্গে শিল্পী বলেন 'আমি যখন স্কুলের ছাত্র,স্বপ্ন ছিল আর্ট স্কুলে ভর্তি হব। স্কুলে থাকতেই আঁকাআঁকি। দেয়ালপত্রিকায় ছবি আঁকি। বই-পুস্তক মায় পরীক্ষার খাতায় পর্যন্ত আঁকার ব্যাপ্তি। একটা নেশার মতো' (কাইয়ুম, ২০১৬ : ১৩)। এ নেশা যেন পরিণত হয় স্বপ্নে। সেই স্বপ্ন পূরণের পথে এক ধাপ এগিয়ে গেলেন ময়মনসিংহ সিটি কলেজ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর (১৯৪৯)।

ঢাকা গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী। সহপাঠী ছিলেন রশীদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, আবদুর রাজ্জাকসহ অনেকে। প্রথম ব্যাচের ছাত্র আমিনুল ইসলামের সাথে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে, বন্ধুত্ব হয় কবি, সাহিত্যিক আর সুরশিল্পীদের সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান হাফিজুর রহমান, জহির রায়হান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সমর দাস প্রমুখ। বই পড়া, সংগীত প্রীতির পাশাপাশি যুক্ত হয় চলচ্চিত্রানুরাগ। ফলে এসব কিছুর সম্মিলনে ছাত্রাবস্থাতে তাঁর নিজস্ব শিল্প ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয় (আজিজুল, ২০০৭ : ৩৮০)। ফলে শিল্পশিক্ষার্থী থেকে শিল্পী হয়ে ওঠা পর্যন্ড় বা সমগ্র জীবনব্যাপী তাঁর কাজে স্বকীয়-তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।

ছাত্রত্ব শেষ হয় ১৯৫৪ সালে এবং যুক্ত হন কমার্শিয়াল কাজে। বইয়ের প্রচ্ছদ অলংকরণসহ যুক্ত থেকেছেন নানা বিজ্ঞাপনী সংস্থায়। ১৯৫৮ সালে যোগ দেন চারুকলা ইনস্টিটিউটে। ১৯৬০ সালে চারুকলা ইনস্টিটিউটের চাকরি ছেড়ে যোগ দেন ডিজাইন সেন্টারে। ১৯৬১ সালের শেষের দিকে ডিজাইন সেন্টারের চাকরি ছেড়ে যোগ দেন অবজারভার পত্রিকার চিফ আর্টিস্ট হিসেবে। সিনেমার সহকারী পরিচালক হিসেবেও পরিচয় পাওয়া যায় শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর। ১৯৬১ সালের দিকে *মাটির পাহাড়* নামক গল্পের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত সিনেমায় সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। একই দায়িত্ব পালন করেন ১৯৬৫ সালে শেকস্পিয়ারের 'কমেডি অব

এররস্' অবলম্বনে সৈয়দ শামসুল হক নির্মিত *ফির মিলেঙ্গে হাম দোনো* শীর্ষক সিনেমায়। ১৯৬৫ সালে পুনরায় চারুকলা ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং এ প্রতিষ্ঠানে ত্রিশ বছর শিক্ষকতার পর ১৯৯৪ সালে প্রফেসর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন (আজিজুল, ২০১৫ : ৫৪-৭৭)। অতএব বলা যায় যে, জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে শিল্পী কাইয়ুম জড়িয়েছেন নানা পেশায় এবং শেষ পর্যন্ত থিতু হন চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষকতায়। তবে সবকিছু ছাপিয়ে বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণে তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়, এ বিষয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন নিজস্ব একটি ধারা — যা তাঁকে অগ্রপথিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, তিনি বাংলাদেশের প্রকাশনার জগৎকে করেছেন সমৃদ্ধ।

প্রচ্ছদ এঁকে পেয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। ১৯৫৯ ও ১৯৬১ সালে রেলওয়ে টাইম টেবলের প্রচ্ছদ এঁকে দুবার সেরা পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৭৫ সালে প্রচ্ছদশিল্পে অসামান্য অবদানের জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র তাঁকে স্বর্ণপদক প্রদান করে (আজিজুল, ২০১৫ : ৮৬)। শুধু প্রচ্ছদশিল্পী নয়, সৃজনশীল চিত্রশিল্পী হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগেই। ১৯৬১ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে চিত্রকলায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে পঞ্চম তেহরান বিয়েনালে চিত্রকলায় ইম্পেরিয়াল কোর্ট প্রাইজ অর্জন করেন (মফিদুল, ২০০৩ : ১১৮)। শিল্পী তাঁর সৃষ্টিশীলতার স্বীকৃতি স্বরূপ ভূষিত হয়েছেন নানা সম্মাননায়; যেমন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭৭), একুশে পদক (১৯৮৬), বঙ্গবন্ধু পুরস্কার (১৯৯৪), এস এম সুলতান পদক (২০০১) এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা পদক (২০১৪)।

শিল্পী কাইয়ুম আমৃত্যু (মৃত্যু : ৩০ নভেম্বর, ২০১৪) জড়িয়ে ছিলেন শিল্পের সঙ্গে। তিনি যেমন দেশ বিদেশের নানা চিত্রপ্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন, তেমনি ঘুরে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর নানা দেশ, ঘুরেছেন নানা জাদুঘর, দেখেছেন জাদুঘরে রক্ষিত অমূল্য শিল্পকর্মসমূহ। এসব কিছু অবলোকন করে শিল্পী নিজে সমৃদ্ধ হয়েছেন; সমৃদ্ধ করেছেন দেশকে তাঁর সৃজন প্রতিভার মহিমায়।

রাজনৈতিক মানস

কাইয়ুম চৌধুরীর রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় আর্ট কলেজের ছাত্রাবস্থার শুরু থেকেই। বাহান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রথম আন্দোলন। এ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততা পাওয়া যায় শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কার্টুনচর্চার বিস্তৃতি ঘটে পোস্টার, ফেস্টুনের মধ্য দিয়ে। শিল্পী মুর্তজা বশীর, বিজন চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী, ইমদাদ হোসেন প্রমুখ ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যেমন জড়িত ছিলেন, তেমনি পোস্টার, ফেস্টুনের

পাশাপাশি কার্টুনধর্মী সচিত্রকরণ করেন (মাহমুদুল, ২০০৩ : ২২৮)। শিল্পী কাইয়ুমের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রামের প্রতিটি ধাপেই।

১৯৫৩ সালে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিক স্মরণে সদরঘাট থেকে যে মিছিল বের হয় তাতে আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন চিত্রিত ফেস্টুন নিয়ে এবং এ মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন শিল্পী রশীদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীর ও কাইয়ুম চৌধুরী (মফিদুল, ২০০৩ : ২৬)।

১৯৬০-এর দশকের রাজনৈতিক জাগরণেও শিল্পী কাইয়ুম শামিল রেখেছেন নিজেকে। বামপন্থি রাজনৈতিক দলের পোস্টার, ফেস্টুন বা একুশের সংকলনে প্রচ্ছদ অঙ্কনের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে (Kashem, 1998 : 27-58)। গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছাত্র-শিক্ষক-শিল্পীদের মিলিত সভা-সমাবেশ, মিছিলে শিল্পী কাইয়ুম অংশ নিয়েছেন প্রতিদিন। সে দিনগুলির কথা স্মরণ করে কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, 'বায়ান্ন, উনসত্তর বা একাত্তরের মতো দিনগুলোতে, যখন এরকম গণঅভ্যুত্থান ঘটে, তখন আমি মানসিকভাবে ভীষণ সম্পৃক্ত হয়ে পড়ি। আমি সমাজ সচেতন, রাজনীতি সচেতন মানুষ' (মতিউর, ২০১৫ : ৩৫)। ফলে বাঙালির অগ্নিঝরা দিনগুলিতে কাইয়ুমের তুলি ছিল সর্বদা উচ্চকিত।

১৯৭১-এর মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে — ১২ই মার্চ ঢাকায় আর্টস কাউন্সিল গ্যালারিতে বিকেল ৪ টায় চারু ও কারু শিল্পীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে সভাপতিত্ব করেন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেন। এ সভায় শহিদ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজনসহ সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। উক্ত সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক মনোনীত হন শিল্পী মুর্তজা বশীর ও কাইয়ুম চৌধুরী। সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা হলেন — শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, হাশেম খান, নাসির উদ্দিন, আনোয়ার হোসেন, কাজী আবদুল বাসেত, প্রফুল্ল রায়, নিতুন কুণ্ডু, মতলুব আলী, কে.জি. মুস্তফা, হাসান হাবীব ও সিরাজ (মুর্তজা, ২০১৪ : ২৮০-২৮১) (আতিউর, ২০০৪ : ১২৩)। এ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ :

১. বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের 'প্রতীক'কে জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সংগ্রামী মনকে প্রেরণা দেওয়া এবং উদ্বুদ্ধ করা।
২. সভা-মিছিলে সাইক্লোস্টাইল করে অথবা ছাপিয়ে দেশাত্মবোধক ও সংগ্রামী স্কেচ বিতরণ করা।
৩. আন্দোলনমুখী পোস্টার ও ফেস্টুন প্রচার।
৪. পোস্টার ও ফেস্টুনসহ মিছিলের আয়োজন।
৫. এই পরিষদের ইউনিটগুলোর বিশেষ জরুরি অবস্থায় অন্যান্য সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে

প্রয়োজনীয় কাজে অংশগ্রহণ। (মুর্তজা, ২০১৪ : ২৮০-২৮১)

'চারু ও কারু শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ'-এর সিদ্ধান্তসমূহ থেকে একদিকে যেমন চারুশিল্পীদের সংগ্রামী চেতনা ও মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে এর মাধ্যমে ব্যক্তি কাইয়ুম চৌধুরীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ, মঙ্গলবার 'বাংলা চারু ও কারু শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ'-এর ব্যানারে ঢাকার শিল্পীসমাজ 'স্বাধীনতা' শব্দকে ধারণ করে রাজপথে বেরিয়ে আসেন, যার নেতৃত্ব দেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (নজরুল, ১৯৯৫ : ৪৬)। ওই দিনের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের সমাবেশে প্রায় পঁয়ত্রিশটির মতো কার্টুন, ফেস্টুন, পোস্টার ছিল। সব কার্টুনেরই বিষয় ছিল সে সময় দেশের বিস্ফোরণোন্মুখ রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ওই মিছিলের কয়েকটি কার্টুন ও ফেস্টুনের ভাষা ছিল এরকম — 'শোষণমুক্ত বাংলাদেশ কায়েম কর', 'আমার দেশের ফসল নিয়েছ তুমি, আমাকে দিয়েছ সমূহ সর্বনাশ, তোমার ওখানে মরুতে ফসল এলো, শুধু অনাহারে কেটেছে আমার দিন,' 'বিদ্রোহ চারিদিকে বিপ্লব আজ', 'তল্পী এবার গুটাও ভাই, বাঁদর নাচ ক্ষান্ত দাও' প্রভৃতি। মিছিলে অংশগ্রহণ করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দীন আহমদ, মুর্তজা বশীর, আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী প্রমুখ (*দৈনিক ইত্তেফাক* ও *পূর্বদেশ*, ১৭ মার্চ ১৯৭১)। সমাবেশ শেষে মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং মিছিলটি বাহাদুর শাহ্ পার্কে গিয়ে শেষ হয়। এ সমাবেশ এবং স্বা ধী ন তা শব্দটি (চারটি অক্ষর) বুকে ধারণ করে মিছিলে সমবেত হয়ে তাঁরা স্বাধীনতা অর্জনের পথেই পা বাড়ান।

এভাবে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আন্দোলন-সংগ্রামে কাইয়ুম চৌধুরীর সক্রিয়তা লক্ষ করা যায়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ঢাকায় এক প্রকার বন্দি জীবন-যাপন করলেও মুক্তিযোদ্ধাদের সহয়তামূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁদের সাফল্য তথা স্বাধীনতা কামনা করেছেন মনে প্রাণে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়ে বাঙালির সকল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলন-সংগ্রামে সম্পৃক্ত থেকেছেন। শুধু শিল্পের ভাষাতেই নয়, সভা সমাবেশে ছিল তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি। ১৯৯০-এর দশকের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন কাইয়ুম চৌধুরী। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৮৬ সালে তাঁকে একুশে পদকের জন্য মনোনীত করলে তিনি তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকার প্রধানের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে সেই পদক গ্রহণ করেন ১৯৯২ সালে (মতিউর, ২০১৪ : ৬২)। এভাবে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা-ধর্মান্ধতা-জঙ্গিবাদবিরোধী, যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ বিচারকামী, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিমুখর ব্যক্তি হিসেবে। তিনি প্রকৃতপক্ষেই ছিলেন রাজনীতিসচেতন এক প্রতিবাদী সত্তা।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্রকলা

বাঙালির আন্দোলন, সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা যেসব শিল্পীর তুলির আঁচড়ে পরম ভালোবাসায় উঠে এসেছে, কাইয়ুম চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। শিল্পীর শিল্পচিন্তায় মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপক অভিঘাত লক্ষ করা যায়। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিল্পকর্ম সৃষ্টি প্রসঙ্গে শিল্পীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> একটি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সকল মানুষের কাজের একটি Turning Point। দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে আমরা যারা আঁকিয়ে তাদের কাজেও এক অদ্ভুত পরিবর্তন এল — সকলের ক্যানভাসের রঙ গেল পাল্টে। আমি মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে কেবল জেনোসাইডের ওপর ছবি আঁকতাম। এরপর আবুল হাসনাতের সম্পাদনায় 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প' বইটির প্রচ্ছদ আঁকতে গিয়ে প্রথম ভাবনায় এল — মুক্তিযুদ্ধে যে সকল সাধারণ মানুষ বৈঠা, লাঙ্গল, কাস্তে ফেলে হাতে তুলে নিয়েছিল রাইফেল, তাঁরাই তো এই মহান মুক্তিযুদ্ধের নায়কদের একটি বিরাট অংশ। তাঁদের অপরিসীম সাহস আর মনোবল যুদ্ধকে নিয়ে যায় সফল পরিণতির দিকে। সেই ভাবনা থেকে আমার শুরু — মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ছবি আঁকা। সেই থেকে বদলে গেল আমার ছবির রঙও। উজ্জ্বল রঙে আঁকতে থাকলাম স্বাধীনতা যুদ্ধে সাধারণ মানুষের গল্প-বিজয়ের গাথা। (বোরহানউদ্দিন, ২০০৯ : ৩২)

কাইয়ুম চৌধুরীর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কাজগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য *প্রতিবাদ, ৭ই মার্চ '৭১, বাংলাদেশ' ৭১, স্বাধীনতা, মৃত জেলে, শহীদ' ৭১, বন্দর জ্বলছে, দগ্ধগ্রাম, জ্বলন্ত গ্রাম* ইত্যাদি। শিল্পী ১৯৭২ সালে তেলরঙে আঁকেন *প্রতিবাদ* শীর্ষক ছবি (চিত্র : ১)। এই চিত্রের উৎস সম্পর্কে শিল্পী বলেন :

> ...in 1969, when the boatmen thronged the city to vent their discontent and to march side by side with others in the processions during those tumultuous days of political unrest. They brought their 'boithas' 'oars'. I tried to record that unprecedented event. (Mustafa, 2003 : 5)

উল-ম্ব বিন্যাসের এ চিত্রের জমিন জুড়ে ছড়িয়ে আছে নানা রং, জ্যামিতিক ফর্ম আর নক্শার সমাহার। আধাবিমূর্ত রীতির এ চিত্র শিল্পীর বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। জ্যামিতিক ঢঙে শিল্পী উপস্থাপন করেছেন ১৯৬৯ সালের আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলনে ঢাকার রাজপথে বৈঠা উঁচিয়ে বুড়িগঙ্গার দরিদ্র মাঝিদের মিছিলের একাংশ। এ চিত্রে মাঝিদের বৈঠার উপস্থিতি আমাদের পাল আমলের কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং বাঙালির হাজার বছরের প্রতিবাদী চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে। চিত্রে বিম্বিত হয়েছে নীল আকাশে সাদা মেঘ, নদী, নৌকা, ত্রিভুজাকৃতি রঙিন পতাকা, সবুজ বৃক্ষরাজি সবকিছু মিলে উৎসবমুখর শ্যামল বাংলার প্রতিচ্ছবি। শিল্পী বলতে চেয়েছেন বাংলার শান্তিপ্রিয় মানুষ সময়ের প্রয়োজনে হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। কাইয়ুম চৌধুরীর এ শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে মফিদুল হক (২০০৩) বলেন,

> ছবির উৎস প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ঊনসত্তর সালের আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলনকালে ঢাকার রাজপথে বৈঠা উঁচিয়ে বুড়িগঙ্গার দরিদ্র মাঝিদের মিছিল, দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তখন তাঁরাও শামিল। শহরবাসী মননশীল শিল্পী, যিনি নৌকা ও বৈঠার ফর্মকে তাঁর ছবিতে নানারূপে তুলে এনেছেন, সেই সময়কার দেখা অজস্র মিছিলের মধ্যে এই মিছিলের দৃশ্যই যে তাঁর চোখে গাঢ় হয়ে ভাসবে তা বিচিত্র নয়।... উঁচিয়ে ধরা বৈঠার ফর্মগুলো বয়ে এনেছে উৎসবের আমেজ, ত্রিকোণ পতাকা কিংবা আকাশপানে বাড়িয়ে রাখা হাত যে উৎসবমুখরতাকে আরো ঘনসংবদ্ধ করেছে, পত্রপল্লবের নকশায় শিল্পীর পূর্বতন ছবির ধারাবাহিকতা শনাক্ত করা যায়। তবে বিশেষভাবে লক্ষ করতে হয় ফিগারকে তিনি যেভাবে ডিজাইনে নিয়ে এসেছেন এবং মাঝিদের বিস্ফারিত চোখ ও নৌকার গলুইয়ের চোখ যেন একাকার করে দিয়েছেন।... (পৃ. ৩৮-৩৯)

উত্থিত বৈঠা, পতাকা, মুষ্টিবদ্ধ হাত, বিস্ফারিত চোখ, অভিব্যক্তিতে প্রচণ্ড দৃঢ়তা সবকিছু মিলে বাঙালির প্রতিবাদীরূপ বিধৃত হয়েছে এ চিত্রে এবং চিত্রের নামকরণেরও যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

শিল্পী একই সালে মেসোনাইটে তেলরঙে আঁকেন '৭ই মার্চ '৭১' শীর্ষক চিত্রটি (চিত্র-২)। আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটিও জ্যামিতিক নানা ফর্মে আঁকা, টকটকে লাল, সবুজ, হলুদ, নীল, কমলা নানা রঙের সমাহারে ঠাসবুনটে রচনা করেছেন চিত্রের জমিন — এ এক বর্ণিল বিন্যাস। এ চিত্রের পটভূমি নির্মিত হয়েছে ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চকে কেন্দ্র করে। ৭ই মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে খুবই তাৎপর্যময় একটি দিন। বাঙালির হাজার বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি লাভের পূর্বে প্রস্তুতির লক্ষ্যে দিকনির্দেশনার একটি দিন। ৭ই মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাড়ে সাত কোটি বাঙালির উদ্দেশে রমনার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) ১৮ মিনিটের এক ভাষণ প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে পাকিস্তানের ২৩ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস ও বাঙালিদের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে বাঙালিদের দ্বন্দ্বের স্বরূপ তুলে ধরেন। অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করে বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা করেন, সারা বাংলা জুড়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ প্রদান করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার ইঙ্গিত দেন, শত্রু মোকাবেলায় গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করার এবং যে কোনো উস্কানির মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন (হারুন, ২০০৯ : ৪৫৭)। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা মন্তব্য করেন :

> বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ কোনো তৈরি করা বক্তৃতা নয়। তা স্বতঃস্ফূর্ত ও সরাসরি চেতনায় প্রস্ফুটিত হয়ে হৃদয় থেকে উৎসারিত। কিন্তু অতি সুসম্বদ্ধ; অতিকথন নেই, পুনরুক্তি নেই, হোঁচট খাওয়া, বা থামাথামিও নেই। নিখুঁত-ঠাসবুনুনি। ঝড়ের মতো বলা, অথচ প্রতিটি কথা স্পষ্ট–ধ্বনিসুষমায় যেন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী গানের দ্রুতলয়ের মেজাজ। ইতিহাস মুখর হয়ে ওঠে তাঁর বলায়। কণ্ঠে ঘোষিত হয় ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ। এ ইতিহাস শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙালি জীবনে সকল বঞ্চনার প্রেক্ষাপটে সকল স্বপ্নকল্পনা নিয়ে গড়া। তা থেকে জাগে সংকল্প। তালিকা রচিত হয় কর্তব্যের এবং এ সবই ওই ক'মিনিটের ভাষণে। কাল স্তম্ভিত হয়ে থেকেছিল বুঝি ওই ক'মিনিটের পরিসরে। (সনৎকুমার, ২০১৫ : ৭২)

বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে চেতনায় শানিত করে, উজ্জীবিত করে তোলে মরণপণ লড়াইয়ে। সেদিন রেসকোর্স ময়দান পরিণত হয় জনসমুদ্রে, সমগ্র পূর্ববাংলা যেন উপস্থিত হয় সেখানে। কৃষক, জেলে, শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, মোট কথা সমাজের সর্বস্তরের মানুষ হাজির হয় রেসকোর্স ময়দানে। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর এই চিত্রের জ্যামিতিক গড়নের মুখাবয়ব যেন সেই চেতনা ধারণ করে আছে। মুষ্টিবদ্ধ দৃঢ় হাত, স্বাধীন বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত পতাকা, লাঠি, নৌকার বৈঠা ইত্যাদির উপস্থিতিতে মনে হয় চিত্রের দৃঢ়চেতা বাঙালি লড়াইয়ের জন্য সদা প্রস্তুত। টকটকে লাল, আর ঘন সবুজ রং দিয়ে শিল্পী তারুণ্যদীপ্ত, মুক্তিকামী, বিপ্লবী বাঙালিকে তুলে ধরেছেন। চিত্রে রঙের ব্যবহার প্রসঙ্গে কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, 'সে সময় দেশ যে উত্তেজনায় কাঁপছে, সেটা বোঝানোর জন্য আমি লাল ও অন্যান্য রং ব্যবহার করেছি' (মতিউর, ২০১৫ : ৩৫-৩৬)। চিত্রে রঙের ব্যবহারে শিল্পী এতটাই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে, দেখে মনে হয়, এ যেন সত্যিই '৭১-এর ৭ মার্চের টানটান উত্তেজনাপূর্ণ একটি দিন।

কাইয়ুম চৌধুরী তেলরঙে আঁকেন 'শহীদ'৭১' শীর্ষক চিত্র (চিত্র-৩)। এর পুরো চিত্রপটে হলুদ রঙের আধিক্য চোখে পড়ে। চিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করে ব্যবহৃত হয়েছে লাল, নীল, সবুজ রং। চিত্রের ভিত্তিভূমিতে পড়ে রয়েছে মানুষের মৃতদেহ, ওপরের দিকে চারটি পাখি (কাক)। একে অপরের দিকে চেয়ে আছে। যেন অশনি সংকেত ছড়িয়ে দিচ্ছে একে অপরের মাঝে। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুদীর্ঘ কালের ধারাবাহিক সংগ্রামের সর্বোচ্চ পরিণতি '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অসীম ত্যাগের বিনিময়ে। এ চিত্র যেন সেই শহিদদেরই প্রতীকী উপস্থাপন। শিল্পী এ চিত্রটিতে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের আত্মাহুতির কথাই বর্ণনা করেছেন রং-রেখার ভাষায়।

'বাংলাদেশ'৭১' (চিত্র-৪) শীর্ষক চিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে ১৯৭১ সালের যুদ্ধপীড়িত বাংলাদেশকে। এই চিত্রের ভিত্তিভূমিতে পড়ে রয়েছে অসংখ্য লাশ। লাশের ওপর বসে থাকা কাক। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার স্বাক্ষর এ চিত্র। ১৯৭১-এর নয় মাস জুড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞে বাংলাদেশের সমগ্র প্রান্তর যেন পরিণত হয় শ্মশানভূমিতে। সমবিমূর্ত ধারার এ চিত্রের পুরো জমিনজুড়ে সে কথারই বর্ণনা রয়েছে। এ চিত্র আমাদের মনে করিয়ে দেয় ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বরের কথা। বাঙালির বিজয় সুনিশ্চিত জেনে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আর তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর, আলশামস মিলে সুপরিকল্পিতভাবে নির্মম, বর্বর আর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জন্ম দেয় ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। জাতিকে মেধাশূন্য করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা হত্যা করে

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, লেখক, শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংবাদিক যাঁদের কয়েকজনের ক্ষত-বিক্ষত হাত-পা, চোখ-বাঁধা লাশ খুঁজে পাওয়া যায় রায়ের বাজার এলাকায়–মানব বসতি থেকে দূরে ধানখেত, জলাশয় আর ইটভাটার মাঝে। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানরা প্রাণ হারায় দেশের জন্য। বাঙালি জাতির এমন আত্মত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

এ চিত্র আমাদের আবেগতাড়িত করে, এ আবেগ '৭১-এর শহিদদের প্রতি পরম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার।

তাঁর 'মৃতজেলে' (চিত্র-৫) শীর্ষক চিত্রেও দেখা যায়, পানিতে ভাসমান জেলেদের লাশ, পানির সাথে প্রবহমান তাদের রক্তের ধারা। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সত্যিকার অর্থেই এক জনযুদ্ধ। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বাংলার সকল পেশার, সকল শ্রেণি-ধর্ম-গোত্রের মানুষ। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, ফলে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এদেশের জেলে সম্প্রদায়, অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছে প্রাণ। জেলেদের সেই অকৃত্রিম ত্যাগের বিষয়টি তুলে ধরেছেন শিল্পী এ চিত্রের মধ্য দিয়ে।

'স্বাধীনতা' (চিত্র-৬) শীর্ষক চিত্রেও একই বিষয়, শুধু উপস্থাপন বা বিন্যাসের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। 'স্বাধীনতা' শীর্ষক চিত্রটিতে দেখা যায় চারিদিকে লাশ, কঙ্কালের খুলি। চিত্রের ঠিক মাঝ বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে বড় করে কঙ্কালের খুলি, এর মুখ বরাবর লেখা রয়েছে স্বাধীনতা। শিল্পী এখানে বুঝিয়েছেন যে, লক্ষ লক্ষ বাঙালি অকাতরে প্রাণ দিয়েছে শুধু দেশের স্বাধীনতার জন্য এবং এ স্বাধীনতার পেছনে রয়েছে বাঙালির অসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার ইতিহাস। ১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশের নিরীহ বাঙালিদের ওপর শুরু করে গণহত্যাযজ্ঞ। পৈশাচিকতার এমন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এমন প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬এ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় বাঙালির সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। যে যুদ্ধে একদিকে রয়েছে বাঙালির প্রাণপণ লড়াইয়ের কাহিনি, বীরত্ব আর ত্যাগের মহিমাগাথা, অন্যদিকে রয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের কথা। তাদের নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী চলতে থাকে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও আর তাদের এদেশীয় সহযোগী কর্তৃক গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন আর অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হয় সারা বাংলা। সমগ্র বাংলাদেশ যেন পরিণত হয় এক বধ্যভূমিতে। এভাবে লক্ষ প্রাণের বিনিময়েই অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রাণের স্বাধীনতা। কাইয়ুম চৌধুরী তাঁর এই চিত্রগুলি দ্বারা ইতিহাসের সত্যকে প্রতিভাত করেছেন। তাঁর এ চিত্রগুলিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যার দলিল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। (চিত্র-৪, ৫, ৬)

কাইয়ুম চৌধুরী 'জয়বাংলা' (চিত্র-৭, ৮) এবং 'মুক্তিযোদ্ধা' (চিত্র-৯, ১০, ১১) শিরোনামে বেশ কয়েকটি ছবি আঁকেন। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ছবি আঁকা প্রসঙ্গে শিল্পীর নিজস্ব বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> During the whole nine month long war, I witnessed how we were being tyrannized. As such my artistic interpretations of these facts during the seventies never addressed heroism. At one point it occurred to me that we were victorious in the end, so my attitude reversed, I asked myself, why should only the negative aspects be depicted in paintings? I thought "heroism" would be a subject that would put my concept on the proper track. Around 1978 and 79, I started to explore subjects that brought the freedom fighters at the forefront. (Mustafa, 2003 : 5)

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলির বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত শিল্পীর এ ছবিগুলি প্রায় সবই তেলরঙে আঁকা। বিন্যাসে পার্থক্য দেখা গেলেও রঙের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। প্রায় প্রতিটি ছবিতেই লাল, নীল, হলুদ, সবুজ রঙের বিন্যাস। ছবিগুলিতে দেখা যায় নীল আকাশের বুক জুড়ে সাদা মেঘের আস্তর, উড়ন্ত শান্তির পায়রা, সবুজ-হলুদ রঙা বিস্তীর্ণ মাঠ, নদীতে নৌকা বাঁধা, সবুজ গাছপালায় ঘেরা ঘরবাড়ি সবকিছু মিলে বাংলার চিরচেনা গ্রামীণ পটভূমিতে শিল্পী মুক্তিযোদ্ধাদের এঁকেছেন। এ ছবিগুলির জমিন জুড়ে লাল, হলুদ রঙের আধিক্য চোখে পড়ে বেশি। শিল্পী এ সমস্ত উষ্ণ রং ব্যবহার করেছেন যুদ্ধদিনের উত্তাপ বোঝাতে। এ উত্তাপ মুক্তিযোদ্ধা তথা বাংলার সমগ্র মানুষের প্রাণের উত্তাপ। লাল, হলুদ রং ব্যবহৃত হয়েছে যুদ্ধের বিভীষিকা বোঝাতেও। চিত্রে বাংলার শ্যামল নিসর্গের মাঝে মুক্তিযোদ্ধার উপস্থিতিতে শান্তিপ্রিয় বাঙালিদের প্রয়োজনের তাড়নায় প্রতিরোধমুখর হয়ে ওঠার বিষয়টিই বলতে চেয়েছেন, সময়ের দাবিতে তাঁরা হয়ে উঠেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামের কৃষক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি ইত্যাদি নানা পেশার নানা বয়সের মানুষ। কাইয়ুম চৌধুরীর মুক্তিযোদ্ধারা মাথায় গামছা বাঁধা কর্মঠ, বলিষ্ঠ; মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বন্দুক, বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত লাল সবুজের পতাকা, মুখে রণধ্বনি 'জয় বাংলা'।

কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা 'মুক্তিযোদ্ধা' প্রসঙ্গে সৈয়দ শামসুল হকের মন্তব্য উল্লেখের দাবি রাখে :

> ঈষৎ পাশ ফেরা মুখ, মাথায় গামছা বাঁধা, সম্মুখে প্রত্যয়ী দৃষ্টি, হাতে রাইফেল, কিংবা কখনও কেবলি সেই শক্ত করে গামছা বাঁধা মাথাটুকু – কাইয়ুম এভাবেই মুক্তিযোদ্ধার মুখটিকে আমাদের জন্য একমাত্র ও চিরকালের করে যাবেন, আমরা তাঁর এই মুখটির ভেতর দিয়েই বাংলার প্রাণশক্তিকে দেখে উঠব ইতিহাসে। (শামসুল, ২০১৪ : ৭)

শিল্পী এ চিত্রগুলির মাধ্যমে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস আর বীরত্বগাথাকেই মেলে ধরেছেন আমাদের সামনে। লড়াইয়ের মানসিক দৃঢ়তা উদ্রেককারী এ চিত্রগুলি যেন বাঙালির প্রাণশক্তির প্রতীক, প্রেরণার আধার।

'মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী' শীষর্ক মুর‍্যাল চিত্রটি রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক (রাজশাহী শাখা) ভবনের প্রধান ফটকে। (চিত্র-১২)। এ চিত্রটিকে প্রধানত দুটি অংশে ভাগ করা যায় — একদিকে উত্তরবঙ্গের ভূপ্রকৃতি, অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি। চিত্রের বামপাশে ওপরের দিকে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার বা সোমপুর বিহারের উপস্থিতিতে প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলের গৌরবময় ঐতিহ্যের বিষয় নির্দেশিত হয়েছে। নদী-নৌকা, মহিষ-গাড়ি ইত্যাদি দ্বারা এ অঞ্চলের জীবন-জীবিকার কথা বলা হয়েছে। এ চিত্রের মাঝখানে রয়েছে সূর্য, যে সূর্য দ্বারা উত্তরবঙ্গের উষ্ণ প্রকৃতির পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের অমিত তেজের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ডিজাইনধর্মী এ চিত্রে মূলত ফুটে উঠেছে রাজশাহী তথা উত্তরবঙ্গের আবহমান কালের ইতিহাস-ঐতিহ্য, প্রকৃতি ও জীবনযাত্রার কথা — যে জীবনযাত্রায় জড়িয়ে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অমর কাহিনি। এ চিত্রে চিত্রিত গ্রামীণ মুক্তিযোদ্ধারা বরেন্দ্রের প্রকৃতির মতো তেজদীপ্ত ও প্রমত্তা পদ্মার মতোই দুর্বার।

কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকলা যেন সামগ্রিক বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। সমগ্র চিত্রপট জুড়ে বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার চিত্র। বাংলার লোকায়ত সমাজজীবনই তাঁর চিত্রের প্রধান উপজীব্য। তাঁর চিত্রের লাল, নীল, সবুজ, হলুদ রং — বাংলার প্রকৃতির রং, বাংলার লোকঐতিহ্যের রং। তাঁর রেখার বলিষ্ঠতা, সাবলীল তুলি চালানোর প্রেরণা-উৎসও বাংলার লোকচিত্র। শুধু বাংলার নিসর্গ, লোকজীবন, লোকঐতিহ্যই নয়, বাঙালির গর্বের মুক্তিযুদ্ধও শিল্পীর চিত্রে ধরা দিয়েছে অনন্য স্বকীয়তায়। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায় তাঁর চিত্রে। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উনসত্তরের উত্তাল দিনগুলিতে সমগ্র বাঙালি জাতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, যার প্রকাশ লক্ষ করা যায় কাইয়ুমের চিত্রকলায়। তাঁর চিত্রকলায় বিধৃত হয়েছে নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের নানা দিক। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা, পৈশাচিকতায় সমগ্র বাংলাদেশ পরিণত হয় বধ্যভূমিতে — যার জীবন্ত রূপ যেন প্রত্যক্ষ করা যায় তাঁর চিত্রকলায়! তাঁর চিত্রকলায় বিধৃত মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামের অদম্য সাহসী, তাজা-তরুণ প্রাণ, মাথায় তাঁদের লাল কাপড়ের পট্টি — যা তাঁদের প্রাণ-প্রাচুর্যের প্রতীক, বাঙালির সংগ্রামশীলতার, মুক্তিসংগ্রামের প্রতীক। মোট কথা তাঁর চিত্রকলায় বিধৃত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের কথা, তাঁদের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের কথা, মুক্তিযোদ্ধাদের তেজস্বিতার কথা। কাইয়ুম চৌধুরীর মুক্তিযুদ্ধের চিত্রমালা বাঙালির গৌরবগাথা — যা বাঙালিকে প্রেরণা যোগাবে দীর্ঘকাল।

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর শিল্পকর্মের আলোকচিত্রসমূহ:

চিত্র-১. *প্রতিবাদ*, ১৯৭২

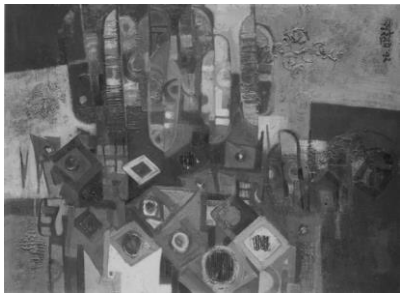

চিত্র-২. *৭ই মার্চ'৭১*, ১৯৭২

চিত্র-৩. *শহীদ'৭১*, ১৯৭২

চিত্র-৪. *বাংলাদেশ'৭১*, ১৯৭২

চিত্র-৫. *মৃতজেলে*, ১৯৭২

চিত্র-৬. *স্বাধীনতা*, ১৯৭২

চিত্র-৭. *জয়বাংলা*, ১৯৯৬

চিত্র-৮. *জয়বাংলা*, ১৯৯৬

চিত্র-৯. *মুক্তিযোদ্ধা*, ২০০০

চিত্র-১০. *মুক্তিযোদ্ধা* , ২০০৩

চিত্র-১১. *মুক্তিযোদ্ধা*, ২০১১

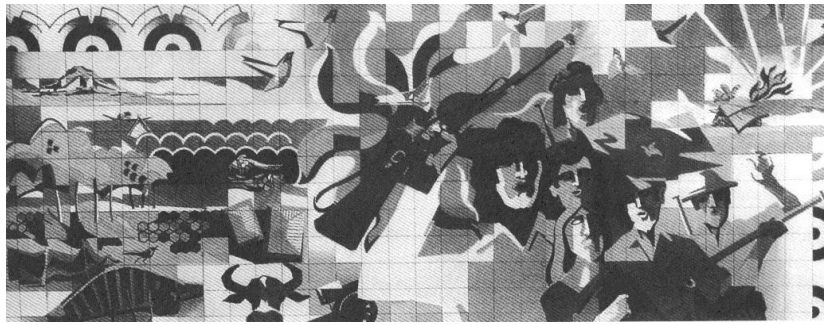

চিত্র-১২. *মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী*, ১৯৯৮

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

ক. গ্রন্থ

আজিজুল হক, সৈয়দ ২০১৫। *কাইয়ুম চৌধুরী : শিল্পীর একান্ত জীবনকথা*, ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন।

আতিউর রহমান, ২০০৪। *অসহযোগের দিনগুলি : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ।

কাইয়ুম চৌধুরী, ২০১৬। *জীবনে আমার যত আনন্দ*, ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন।

নজরুল ইসলাম, ১৯৯৫। *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও অন্যান্য (সম্পা.), ২০০৯। *সাদাকালো'৭১*, ঢাকা : সাদাকালো।

মতিউর রহমান, ২০১৪। *আকাশ ভরা সূর্য তারা*, ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন।

মফিদুল হক, ২০০৩। *কাইয়ুম চৌধুরী*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

মিজান রহমান (সম্পা.), ২০০৯। *বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

মুর্তজা বশীর, ২০১৪। *আমার জীবন ও অন্যান্য*, ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড।

লালারুখ সেলিম (সম্পা.), ২০০৭। *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), ২০১৫। *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

খ. প্রবন্ধ

আজিজুল হক, সৈয়দ ২০০৭। 'কাইয়ুম চৌধুরী', লালারুখ সেলিম (সম্পা.), *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

মতিউর রহমান, ২০১৫। 'এখন হৃদয়ের গভীরে শূন্যতা' আবুল হাসনাত (সম্পা.), *কালি ও কলম*, একাদশ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা।

মাহমুদুল হাসান, ২০০৭।'ব্যঙ্গচিত্র', লালারুখ সেলিম (সম্পা.), *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

শামসুল হক, সৈয়দ ২০১৪। 'তাঁর রঙ, তাঁর ক্যানভাস' *কালের খেয়া* (*সমকাল* শুক্রবারের সাময়িকী), ঢাকা।

সনৎকুমার সাহা, ২০১৫। 'বঙ্গবন্ধু, সাতই মার্চ ও আজকের বাংলাদেশ', শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

হারুন-অর-রশিদ, ২০০৯। 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের রাজনৈতিক তাৎপর্য', মিজান রহমান (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

Kashem, Abul 1998. 'Student Action Committee (SAC) and the Mass-Upsurge of 1969', Rajshahi University Studies, Part-A Vol. 26.

Mustafa Zaman. 'War : Through the Eyes of the Artists', Mahfuz Anam (ed.), *Star* WEEKEND MAGAZINE. 2003. Volume 5, Issue 337.